শতাব্দী-কন্যা

জন্মের শতবর্ষ ও মৃত্যুর অর্ধ-শতাব্দীকাল পরেও যিনি স্মরণীয় হন বাংলাদেশের ঘরে-ঘরে, তিনি যে ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, এ বলা যায় সহজেই। এ বিশিষ্টতা যে রোকেয়ার ক্ষেত্রে কী, মনে হয় না তার বিস্তারিত উল্লেখের প্রয়োজন আছে। প্রকৃত যে অবদান, তার মূল্যায়ন স্মরণ বা বরণের ওপর আদৌ নির্ভরশীল নয়। তাই অবাক হওয়ার কিছুই নেই। মহীয়সী রোকেয়া যতোই গরিমসি হোন না কেন, তিনি আজও মহিলাদেরই বিশেষ সম্পদ। এ মহিলাদের মধ্যেও আবার সকলেরই যেন নয়। উত্তরাধিকারীসূত্রে একাধিক জেনারেশন ধরে যাঁরা আলোকপ্রাপ্ত, তাঁদের ঋণ বোধ হয় সকলের কাছেই কিছুটা কম। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের যাঁরা আজও সমাজ-সংস্কারের সঙ্গে যুঝে চলেছেন, তাঁরাই রোকেয়ার স্মরণে আপ্লুত হন। পুরুষসম্প্রদায়ের কাছে রোকেয়া অবশ্যই সাধুবাদ প্রাপ্য— কিন্তু ক'জনের অনুভূতির সঙ্গে রোকেয়া তেমনভাবে সম্পৃক্ত, বলা কঠিন। ফি বছরেই রোকেয়া মুষ্টিমেয় মহিলা সংগঠনের সাধ্যমাফিক উদ্যোগে স্মরণীয় হন। বিশেষত্ব এই, শতবর্ষ অতিক্রান্ত হওয়ার পর রোকেয়া বুদ্ধিজীবী মহলের সভা-সমিতি সিম্পোজিয়ার আলোচনার ক্ষেত্র পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছেন।

ভুক্তভোগী না হলে সমস্যা হৃদয়সম সহজ নয়। তাই আজ বৃহত্তর অংশের দশা যাই হোক। মহিলাদের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশের কেউ কেউ যখন গাড়ির স্টিয়ারিং ঘোরাতে জানেন। এমন কি আকাশচারী হওয়ার প্রশিক্ষণ সাফল্যে সমাপন করেন। যখন উচ্চপদে সমাসীন হয়ে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কক্ষে নীতি নির্ধারণী কর্মকান্ডে অংশ নেন অথবা বিশাল জনসমক্ষে উদাত্ত ভাষণ দেন এবং সংসার জীবনেও সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের স্থান পরম চাতুর্যে দখল করেন। তখন এই মেয়েদের সম্পর্কেই এই দেশের এককালের দৃষ্টিভঙ্গী ও শোষণ শাসন অনুধাবন করা কষ্টকর বইকি। তাই কোন কালে কোথায় কোন মেয়ে মশারির নীচে হুমড়ি খেয়ে চলাফেরা করেছে অথবা দোরপ্রান্তে ভিন্ন নারীর কলকন্ঠে কোন কিশোরী কোথায় আত্মগোপন করেছে—সে আজ গল্পের মতই উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে। নারীকে নিয়ে ঘর, বর পরিবারের প্রচলিত ভাবধারার কঠোরতার বর্ণনা অথবা দিনের উজ্জ্বল আলোয় জীবন সহচরের সঙ্গে পর্যন্ত দেখা না দেবার বাধ্যবাধকতা পরম কৌতুকের হয়ে উঠবে—আশ্চর্য কি। এই অবস্থা থেকে আজকের যে অগ্রগতি, তা যেন কালেরই স্বাভাবিক উত্তরণে, এর বেশি কিছু নয়—এমন দার্শনিক মতবাদও বা ঠেকাবার উপায় কী।

রোকেয়ার সফলতার পেছনে কেউ কেউ যেন রোকেয়ার পরম সৌভাগ্যের অস্তিত্বই বেশি করে অনুভব করে ফেলেন। রোকেয়ার ভাগ্য, তিনি আর কোনও পরিবারে না জন্মে জন্মালেন সাবের পরিবারের মতো অমন বনেদি পরিবারে—যাঁরা মেয়েদের লেখাপড়াকে কোনও দিনই বাঁকা চোখে দেখেননি। রোকেয়ার ভাগ্য তিনি উদার-হৃদয় অগ্রজের ভগ্নি হতে পেরেছিলেন; সবচে যা বড়, তা হচ্ছে রোকেয়ার ভাগ্যেই জুটেছে সাখাওয়াৎ সাহেবের মত সুধী বিদগ্ধ দূরদর্শী জীবনসঙ্গী।

কিন্তু এই ভাগ্য রোকেয়ার কৃতিত্বে কতোটা প্রলেপ ফেলে বা কেন ফেলবে, এ প্রশ্ন ওঠে। বরং তিনি তাঁর সুন্দর ভাগ্যের গতানুগতিক ক্রীড়নক না হয়ে তাকে কাজে লাগিয়েছেন সমাজের অবহেলিত অংশের কল্যাণ সাধনে। এই প্রধান হয়ে ধরা দেয় না কি? প্রকৃত বিচারে নারীমুক্তির জন্য রোকেয়ার নিরলস কঠোর সাধনা, মেয়েদের মুক্তির লক্ষ্যে। স্কুলমত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে লেখাকেও পাশাপাশি ব্রত হিসাবে গ্রহণ করা আর নিজের জীবনের সন্তানহীন বৈধব্যকালে সপত্নীপুত্রদের রোষানল ও সমাজের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নিরন্তর যুঝে অবিচল এগিয়ে চলা—সে সময়ের পরিবেশে কতোটা সহজ তা ভেবে দেখা দরকার। কেবল সেই যুগ কেন, আজও বা আজকের সংকট নিয়ে সমাজের বিরূপতার বিরুদ্ধে লড়াই ক'জনের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে? যে যৌতুক আজ বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে। নির্বিচারে নারী-হত্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সর্বত্র, তার বিরুদ্ধে ক'জন মহিলা অকুতোভয় প্রতিবাদী হলেন? ক'জনে কার্যকর প্রতিকার প্রার্থনা করতে পারছেন বা তেমনভাবে মানসিক সাহস রাখেন? না, যাঁদের রাখার কথা তাঁরাও রাখেন না।

বেগম রোকেয়া নারী-মুক্তির যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন—তার সব দায়িত্ব তাঁর একার। ছেলেবেলার বর্ণপরিচয় থেকে আরম্ভ করে জীবনসায়াহ্নে স্কুলের ছাত্রীদের কাছে প্রদত্ত শেষ বক্তৃতা পর্যন্ত ছিল তাঁর একই কথা—তা হচ্ছে আপন মুক্তির লক্ষ্যে নারী-সমাজকে অবিরাম এগিয়ে চলা। চলার পথে নিঃসঙ্গী রোকেয়া যেমন বিরূপতা মোকাবিলা করেছেন, তেমনি সঙ্গী ও সহযোগিতাও লাভ করেছেন। যাঁরা তাঁকে সক্রিয় সাহস দিয়েছেন, তাঁরা দিয়েছেন রোকেয়ারই গুণে; অর্থাৎ সহায়তা দেয়ার ক্ষেত্র রোকেয়ার হাতেই প্রাথমিকভাবে ও দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত হয়ে গেছে।

আজও অনেকেই যথেষ্ট পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েই কাজ করেন। হয়তো কম বেশি সাফল্যও অর্জন করেন। কিন্তু এ সবই তো নিজের জন্য। ক'জনে দশজনের কথা ভাবেন? ক'জনে সংগ্রামী চেতনার আধার? রোকেয়া যেসব ব্যাপারে প্রাণপণ লড়েছিলেন, সেসব অসুবিধার অধিকাংশ থেকেই ব্যক্তিগতভাবে তিনি মুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর দায় তো তাঁর নিজেকে নিয়ে সীমিত ছিল না—তাঁর কাছে সমষ্টির কল্যাণই ছিল বড় কথা। এই সমষ্টির বেদনা ক'জনের পক্ষে উপলব্ধি সম্ভব? এমন নয় যে আমাদের আজকের নারীসমাজ প্রার্থিত মুক্তি করায়ত্ত করে ফেলেছে—এমন নয় যে আজকের স্বচ্ছন্দে বিচরণকারিণীদের অবস্থার মধ্যেই বিধৃত দেশের নারী অবস্থার সর্বাঙ্গীন প্রতিচ্ছবি। অথচ এরি মধ্যে শ্রুত হচ্ছে সমাজের পুরাতন মতবাদের প্রতিধ্বনি। নারীশিক্ষা গৃহশক্তির অন্তরায়, সন্তান পালনই নারীর বড় দায়—এমন কথাও আবার স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। ঘর-ভাঙার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার জন্য অর্থনীতিক বা সামাজিক পরিবেশ নয়, দায়ী করা হচ্ছে শিক্ষিত দম্পতির ব্যক্তিত্বের সংঘাতকে। অর্থাৎ নারীর মুক্তি বা মুক্ত চলাফেরাকে। আজকের পাশ্চাত্য দুনিয়ায় পর্যন্ত ছেলেদের রব উঠেছে, ইন্টেলেকচ্যুয়াল মেয়েরা গার্হস্থ্য জীবনে অসহনীয় হয়ে পড়েছে—অতএব ধরে নেয়া যায় এই সমাজের গতিও যাবে অনিবার্যভাবে সেই দিকে। চিরন্তন পুরুষ হৃদয় চায় নারীর অন্ধ-আনুগত্য—যা তাঁদের ধারণায়, স্বল্প শিক্ষার মধ্যেই নিহিত।

এমন বিভ্রান্তিকর ধারণা বেড়েই চলেছে—অথচ কেউ তো এগিয়ে আসছেন না এর নিরসনকল্পে। এমন একটি মৌলিক সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে একক দূরে থাকুক গোষ্ঠীগত প্রয়াসেও কোথায় সেই দৃপ্ততা? সবই যেন নিয়ম-রক্ষা, সবই যেন আনুষ্ঠানিকতায় ভরা।

আজও মেয়েদের জন্য অবরোধ আছে। আজও মেয়েদের ঘিরে সেই প্রাচীর মাথা তুলে রয়েছে—হয়তো তার রং বদলেছে তবে তার অস্তিত্ব অবশ্যই আছে। প্রয়োজন হচ্ছে শুধু চোখ মেলে দেখা। কিন্তু কোথায় রোকেয়ার মত দুর্লভ প্রাণ-প্রদীপে আলোকিত শতাব্দী-কন্যা? যিনি কান পেতে শুনতে পাবেন আজকের অবরোধ-বাসিনীদের কান্না? তাই বলা যায়—শত বছর পরেও পায়রাবন্দ গাঁয়ের রোকেয়াই আজও আমাদের অবলম্বন, আজও আমাদের ভরসা।

হোসনে আরা শাহেদ